সন্ত্রাস ঃ ঘরে বাইরে

শা হ্ আ ব দু ল হা লি ম

সন্ত্রাস আজ বিশ্বব্যাপী। সন্ত্রাস অতীতেও ছিল। বিভিন্ন সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত্রাস বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে। অতীতের সন্ত্রাস ছিল হোলসেল বা পাইকারি শুধু মহাশক্তিধরদের খেলা। বর্তমানে হোলসেল সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রিটেইল বা খুচরা সন্ত্রাস যা মহাশক্তিধরদের ক্ষমতার তুলনায় অতি তুচ্ছ। অতীতে সন্ত্রাস ছিল সাম্রাজ্যবাদের পেশিশক্তি। বর্তমানে সন্ত্রাস ক্ষেত্রবিশেষে হতাশাগ্রস্ত কল্পনাবিলাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা। অতীতে যেমন, বর্তমানেও তেমনি, সন্ত্রাস পেশিশক্তির বহিঃপ্রকাশ।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অতীতেও ছিল। তবে বর্তমানে তা আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এ দেশবাসীর স্বাধীনতা অস্ত্রবলে কেড়ে নেয়। তাও ছিল এক ধরনের সন্ত্রাস। পাশ্চাত্য আরব ভূখণ্ড থেকে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করে তাদের উদ্বাস্তু বানিয়ে বহিরাগতদের এনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এটাকে আমরা কিভাবে দেখব? একে কি আমরা সন্ত্রাস বলব না? ইসরাইল আশির দশকে ইরাকি পারমাণবিক চুল্লি ধ্বংস করে দেয়। এটাকে আমরা কী বলব? বস্তুত মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের উত্থানের জন্য পাশ্চাত্য বহুলাংশে দায়ী। মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক, স্থিতি লাভ করুক, বিকশিত হোক পাশ্চাত্য এটা চায় না। কেননা মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে তাদের স্বার্থের বিঘ্ন ঘটায়। পাশ্চাত্য আলজেরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্টকে ক্ষমতায় আসতে বাধা দেয় এবং সামরিক জান্তাকে সমর্থন করে। আজকে ফিলিস্তিনে নির্বাচিত হামাসের সঙ্গে পাশ্চাত্য কী ব্যবহার করছে? পাশ্চাত্য হামাসের সঙ্গে এমনকি, গোপন আলাপ-আলোচনা চালাতেও নারাজ।

আমাদের অবশ্যই সন্ত্রাস ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। জাতীয় স্বার্থরক্ষার আন্দোলনকে 'সন্ত্রাসবাদ' আখ্যায়িত করা ঠিক হবে না। বিদেশী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ইরাকি জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব? আমরা কাশ্মীরিদের আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলন না সন্ত্রাসবাদ বলব? পূর্ব তিমুরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে পাশ্চাত্য স্বাধীনতা আন্দোলন বলে স্বীকৃতি দেয়। আজ পূর্ব তিমুর একটি স্বাধীন দেশ।

সুইসাইড বোম্বিং, আত্মঘাতী হামলা নতুন কিছু নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি পাইলটদের আত্মঘাতী হামলার কথা সবার জানা। ইসলাম সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করে না। এ বিষয়ে আমরা সবাই অবগত। ইসলাম নিরীহ নারী-শিশু-বৃদ্ধ বেসামরিক জনগণকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানোর বিরোধী। মিসরের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারজাভি অবশ্য ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে আত্মাহুতি বা সুইসাইডকে বৈধ বলেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন ইসরাইলি মারণাস্ত্রের সামনে ফিলিস্তিনিদের আর কিই বা করার আছে? তিনি অবশ্য বেসামরিক নিরীহ জনগণকে আক্রমণের লক্ষ্য বানানোর বিরোধিতা করেছেন।

আসুন, আমরা এবার বাংলাদেশের দিকে তাকাই। আমাদের দেশে সম্প্রতি যা ঘটেছে তা রিটেইল বা খুচরা সন্ত্রাস। জেএমবির শীর্ষস্থানীয় নেতারা দ্রুত আইনরক্ষাকারী র‍্যাব-পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। এর কারণ হচ্ছে তাদের পক্ষে জনসমর্থন নেই। কথায় বলে, পানি না থাকলে মাছ সাঁতার কাটতে পারে না। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যা শক্তির বলে চাপানো হয়, তা জনগণ গ্রহণ করে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের প্রয়াস তার প্রমাণ।

আইজিপি বলেছেন, 'জেএমবির সঙ্গে কোনো বিদেশী যোগাযোগ নেই।' আমার মনে হয় তিনি একটি অপরিপক্ব মন্তব্য করেছেন। দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তার এ ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকাই উচিত ছিল। বিশেষত বিষয়টি যেহেতু এখন পর্যন্ত তদন্তের পর্যায়ে রয়েছে সে কারণে।

এটাও বোধগম্য নয় জাতীয় দৈনিকগুলো কী করে গোয়েন্দা সংস্থা ও আইন রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন জিজ্ঞাসাবাদের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কারা ফাঁস করছে? এটা দেখা দরকার। এসবের উদ্দেশ্য জাতিকে বিভ্রান্ত করা নয় তো?

কিছু লোক বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণার দাবি করছে। আমার দৃষ্টিতে, দেশের শাসনতন্ত্রে আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা এ নীতির প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। প্রধান দুটো রাজনৈতিক দল

ইসলামবিরোধী আইন প্রণয়ন করবে না এ ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ। যা করা দরকার তা হচ্ছে আইন মন্ত্রণালয়ে বিশিষ্ট আলেম, ইসলামি চিন্তাবিদ ও ইসলামি আইনবেত্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যার জন্য শাসনতন্ত্রের কোনো সংশোধনীর প্রয়োজন হবে না। এ কমিটির কাজ হবে জাতীয় সংসদ যে আইন পাস করবে, তার খসড়া প্রণয়নকালে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যাতে ইসলামবিরোধী ধারাসহ কোনো প্রস্তাবিত আইন, মন্ত্রিসভা বা সংসদে বিবেচনার জন্য না যায়।

বাংলাদেশে ধর্ম পালনে কোনো বিধিনিষেধ নেই। সবাই নিজ নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারে। মহিলারা হিজাব পরতে পারে। মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় কোনো বাধা নেই। কিছু লোক 'আল্লাহর আইন চাই' বলে তারস্বরে চিৎকার করছে। এ কথা দিয়ে তারা কী বোঝাচ্ছে, তা তারা ব্যাখ্যা করে না। বস্তুত আমাদের দেশে ইসলামি আইন বিদ্যমান রয়েছে। যেমন উত্তরাধিকার আইন, ওয়াক্ফ আইন, বিবাহসংক্রান্ত আইন। এসব আইন বহুলাংশে ইসলামসম্মত। সত্যিকার অর্থে আল্লাহ আমাদেরকে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত স্বাধীনতা দিয়েছেন। যেমন তাজিরের ক্ষেত্রে, যেখানে কুরআন-সুন্নাহ নিশ্চুপ। এ ক্ষেত্রে আমাদের আইন প্রণয়নের স্বাধীনতা রয়েছে। যেমন মিউনিসিপ্যাল ল', ট্রাফিক ল', রাস্তায় আমরা ডান বা বাম কোন দিক দিয়ে হাঁটব ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের আইনের অধিকাংশ প্রশাসনিক। তত্ত্বগতভাবে দেশে মূলত ইসলামি আইন চালু আছে। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়। আমরা উমাইয়া ও আব্বাসি খেলাফতের সময়ও ইসলামি আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ ধরনের অসঙ্গতি লক্ষ করি। নবী-রাসূলদের (আঃ) নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে এর বিরুদ্ধে দেশে কোনো আইন নেই। সব ধরনের মাদক নিষিদ্ধ করে দেশে আইন নেই। এ কারণে কিছু লোক সমালোচনামুখর। নবী-রাসূল (আঃ) ও অন্যান্য ধর্মের প্রধান পুরুষদের প্রতি অপবাদ ও কলঙ্কে লেপন নিষিদ্ধ করে ব্লাসফেমি আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। এ আইনে যেকোনো ব্লাসফেমাস কৃতকর্ম দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান থাকতে হবে। সেই সঙ্গে মদ ও সব ধরনের মাদকের উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয়, উপহার হিসেবে প্রদান, আমদানি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে এবং এর লঙ্ঘন ঘটলে এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, ব্যক্তি মুসলমানের কোনো বিচ্যুতি হলেও যেমন মুসলমান থেকে যায়, তেমনি কোনো রাষ্ট্রে শরিয়তের কোনো কোনো দিকের বাস্তবায়নে ব্যত্যয় ঘটলে তাকে ইসলামি রাষ্ট্র নয় বলে মনে করা যথার্থ নয়, যুক্তিযুক্তও নয়।

কেউ কেউ বাংলাদেশের বিরাজমান আইনে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য কোনো শাস্তির বিধান নেই বলে সমালোচনা করেন, মুরতাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধানসহ আইন প্রণয়নের দাবি করেন। কিন্তু সমসাময়িককালের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, ফকিহ ও ইসলামি আইনজ্ঞদের মত হচ্ছে মুরতাদের জন্য জাগতিক শাস্তি নেই। শুধু ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য নবী মুহাম্মদ (সাঃ) হদ প্রয়োগ করেননি, কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেননি। ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী যদি ধর্ম ত্যাগ করার পর ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং অস্ত্র তুলে নেয় তবে তাকে তাজিরের আওতায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য শাস্তি দেয়া যেতে পারে। মালয়েশিয়ার সুপ্রিমকোর্টের রায় হচ্ছে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়।

সূরা আন-নিসার ১৩৭ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'যারা ঈমান আনে ও পরে কুফরি করে এবং আবার ঈমান আনে, পুনরায় কুফরি করে, অতঃপর তাদের কুফরির প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না এবং তাদের কোনো পথও দেখাবেন না।'

এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মোহাম্মদ হাশিম কামালি মন্তব্য করেন ঃ "The implication is unmistakable. The text would hardly entertain the prospect of repeated belief and disbelief if death were to be the prescribed punishment for the initial act. It is also interesting to note that the initial reference to disbelief is followed by further confirmation of disbelief and then 'increase in disbelief'. One might be inclined to think that if the first instance of apostasy did not qualify for capital punishment, the repeated apostasy might have provoked it- had such a punishment ever been intended in the Quran (Mohammad Hashim Kamali, Freedom of Expression in Islam, Ilmiah Publishers, Kuala Lumpur, 1988, pp 97-98).

অর্থাৎ আয়াতে ঈমান আনার পর কুফরি করার কথা বলা হয়েছে। পুনরায় ঈমান আনার পর আবার কুফরি করার কথা বলা হয়েছে। যদি প্রথমবার ইসলাম ত্যাগের পর মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিধান থাকত, তবে আয়াতে পুনরায় ঈমান

আনা ও কুফরি করার কথা বলা হতো না। কিন্তু ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য জাগতিক শাস্তি নেই বলেই পুনরায় ঈমান আনা ও কুফরির কথা বলা হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট শাস্তির কথা উল্লেখ না করেই আয়াতে বলা হয়েছে, যারা বারবার ঈমান আনে ও কুফরি করে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না, পথ দেখাবেন না।

সূরা ইউনুসের ৯৯ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে উদ্দেশ করে বলেছেন ঃ 'আর আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই অবশ্যই ঈমান আনত। তবে কি আপনি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবেন?' সূরা বাকারার ২৫৬ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।'

হুদুদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের সময় এ আদেশ জারি করা হয় যে, কেউ না খেয়ে থাকলে চুরি করার অপরাধে তার হস্ত কর্তন করা যাবে না। যদি হজরত ওমরের এই ইজতিহাদ আমরা ব্যভিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, তাহলে তার অর্থ কী দাঁড়াবে? আমরা কি ব্যভিচারের ক্ষেত্রে দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতে পারি যে পর্যন্ত না আমরা অশ্লীলতার দ্বার বন্ধ করি? যেমন পতিতালয়, বার বা পানশালা খুলে রাখা, অশ্লীল ছায়াছবি প্রদর্শন, অশ্লীল ছবি ও কাহিনীতে ভরপুর বই ও পর্নোগ্রাফির সয়লাব। সর্বোপরি সরকার যদি সময়মতো নারী-পুরুষের বিয়ের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়? হুদুদ বাস্তবায়নে আমাদের কী নৈতিক অধিকার আছে যে পর্যন্ত না আমরা অশ্লীলতামুক্ত সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হই? সম্প্রতি বিশিষ্ট আরব ইসলামি শিক্ষাবিদ ড. তারিক রামাদান হুদুদ সাময়িকভাবে স্থগিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তার মতে, হুদুদসংক্রান্ত সব বিষয় ইসলামি চিন্তাবিদদের দ্বারা নিরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

সম্প্রতি দেশের একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব মতপ্রকাশ করেছেন, বাংলাদেশের ৯৮ শতাংশ আইন ইসলামসম্মত এ বিবেচনায় যে, এসব আইনে এমন কিছু নেই যা কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারজাভি কাতারের কিছু আইন পরীক্ষা করে তার বই 'ইসলাম ঃ আধুনিক যুগ ঃ কৌশল ও কর্মসূচি'তে মত প্রকাশ করেছেন, তিনি কাতারের আইনে আপত্তিকর কিছুই দেখতে পাননি এবং এর অধিকাংশ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের আওতায় প্রণীত এবং কুরআনের কোনো আয়াতের সঙ্গে সরাসরি বিরোধপূর্ণ নয়।

'হিজবুত তাহরীর' বাংলাদেশে ইসলামি খেলাফত দাবি করছে। কিন্তু তারা ব্যাখ্যা করছে না উম্মাহর খলিফা কিভাবে নির্বাচিত হবেন। তার কী কী গুণ থাকতে হবে। কারা এ ধরনের খলিফাকে নির্বাচিত করবেন। তাদের কী কী গুণাবলির অধিকারী হতে হবে। এ খলিফার মেয়াদকাল কী হবে? এ খেলাফতের অধীনস্থ সংসদ কিভাবে গঠিত হবে বা কিভাবে আইন প্রণয়ন করা হবে, তাও হিজবুত তাহরীর ব্যাখ্যা করেনি।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কিছু রাজনৈতিক দল বাংলাদেশকে শাসনতান্ত্রিকভাবে একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে আগ্রহী যার সঙ্গে দেশের অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা ইতিহাসের চাকা পেছনে ঘুরিয়ে অতীতে ফিরতে চান, যা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তারা মাঝে মধ্যেই তাদের দাবির সমর্থনে উসকানিমূলক বক্তৃতা-বিবৃতি দেন। তাদের এসব বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তব্য জনগণের ধর্মীয় সংবেদনশীল অংশের মাঝে স্নায়বিক চাপ সৃষ্টি করে। কেননা তারা দেখছে, সেক্যুলারিজমের নামে ফ্রান্সের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরতে দেয়া হচ্ছে না। ফ্রান্সে সেক্যুলারিজমের নামে এমন বিধিবিধান প্রণয়ন করার কথা আলোচিত হচ্ছে, যা আইনে পরিণত হলে একজন মহিলা চিকিৎসক পুরুষ রোগীদের চিকিৎসা করবেন এবং একজন পুরুষ চিকিৎসক মহিলা রোগীদের চিকিৎসা করবেন। আমাদের দেশের দায়িত্বশীল রাজনীতিবিদদের উচিত সেক্যুলারিজমের পক্ষে অনাকাঙ্ক্ষিত বিবৃতি দেয়া থেকে বিরত থাকা। কেননা তা সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হতে পারে এবং তাতে দেশের অগ্রযাত্রা বিঘ্নিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রথিতযশা লেখিকা ক্যারেন আর্মস্ট্রং সেক্যুলারিজমকে যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য! [Secularism] "Denies the deity of God ... Denies the existence of the soul, life after death, salvation and heaven, damnation and hell ... Believes that there are no absolutes, no right, no wrong, - that moral values are self-determined and situational" (Karen Armstrong, The Battle for God : A History of Fundamentalism, The Random House Publishing Group, New York, 2001, p 270).

অর্থাৎ সেক্যুলাররা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। তারা অস্বীকার করে আত্মা, জীবন ও মৃত্যু। তারা অস্বীকার করে পরকালীন জীবন, দোজখ ও বেহেশত। সেক্যুলাররা চূড়ান্ত সত্য ন্যায়-অন্যায় বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করে যে,

নৈতিক মূল্যবোধ সময়ের প্রেক্ষাপটে নির্ধারিত হয়। সন্ত্রাস দমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাবতে হবে সন্ত্রাস হয় কেন? কেউ কেউ সন্ত্রাসের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করছেন। এটা অতি সরলীকরণ, সাদামাটা বিশ্লেষণ। কওমি ও আলিয়া উভয় পদ্ধতি ব্রিটিশ আমল থেকে চালু আছে। এত বছর তো কেউ বলেনি, মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় সন্ত্রাসী তৈরি হচ্ছে।

কিন্তু এ অভিযোগের জবাব যেভাবে আলেম সমাজের কাছ থেকে আসা উচিত ছিল, তা হয়নি। আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের একটি অংশ সরকারি মাদ্রাসায় চাকরিরত। তারা না হয় তাদের চাকরির কারণে উচ্চবাচ্য করেননি। এ অভিযোগ খণ্ডন করতে বক্তৃতা-বিবৃতি দেননি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, হাটহাজারী ও পটিয়া মাদ্রাসার মতো প্রখ্যাত কওমি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্মানিত শিক্ষকরা তো সরকারি কর্মচারী নন। তারা কেন জোরালোভাবে এ অভিযোগের প্রতিবাদ করেননি? প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, দেশে বিপুলসংখ্যক বেসরকারি আলিয়া মাদ্রাসা রয়েছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আলেম-ওলামা পর্যন্ত এ অভিযোগ খণ্ডন করতে এগিয়ে আসেননি।

দেশের আলেম সম্প্রদায় অতীব গুরুত্ব বহন করেন। তাদের অংশগ্রহণ ব্যতীত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের ছাত্রছাত্রীর ২৫ শতাংশ আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসায় পাঠরত। বাদ বাকি ৭৫ শতাংশ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। এ বিষয়টি মনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জাতীয় ইস্যুতে ভূমিকা রাখতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্র ও ছাত্রীদের ছোট করে দেখার এখন আর কোনো সুযোগ নেই।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, পাশ্চাত্য তা চায় না। বিশেষত এ কারণে যে, অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে মুসলিম দেশসমূহের গণতান্ত্রিক সরকার পাশ্চাত্যের স্বার্থে বিঘ্ন ঘটায়। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থরক্ষার নামে, বিশেষত ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য পঞ্চাশের দশকে ইরানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মোসাদ্দেক সরকারকে উৎখাত করেছিল। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের সমর্থনপুষ্ট ও দুর্নীতিগ্রস্ত মেকি গণতান্ত্রিক সরকার মুসলিম দেশসমূহের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হওয়ার কারণে কিছু হতাশাগ্রস্ত কল্পনাবিলাসী লোক, যারা রাজনীতিতে মূলত মৌসুমি পাখি, ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে অস্ত্র হাতে নিতে উৎসাহী হয়।

প্রশ্ন হলো, কেন জনগণ হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে? এর অন্যতম কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে বিরাজমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত। দেশের প্রধান দুটো দলের নেতা ও মন্ত্রী মহোদয়গণ সবাই, দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া, দুর্নীতি থেকে মুক্ত নন। দুর্নীতির কারণে জনগণের ভোগান্তির শেষ নেই। আর এ কারণে হতাশাগ্রস্ত লোকেরা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। তারা জেএমবির মতো সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কেননা বিদ্যমান দুটো দুর্নীতিবাজ দলের কোনো রাজনৈতিক বিকল্প নেই। যদি একটি দল ক্ষমতা থেকে সরে যায়, তবে অন্যটি ক্ষমতায় আসে। দুর্নীতির ব্যাপারে এরা একে অপরকে ছাড় দেয়।

দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য আমাদের রাজনীতিকে দুর্নীতিমুক্ত করা প্রয়োজন। আমার প্রস্তাব হচ্ছে, সুপ্রিমকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত সব বিচারপতিকে নিয়ে, নিদেনপক্ষে তাদের মধ্য থেকে যারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, একটি কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটি আগামী সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দুর্নীতিগ্রস্ত কি না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। এ কমিটির কাজ হবে এটা দেখা যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কালো টাকার মালিক নন বা কর ফাঁকি দেননি বা ব্যাংকঋণ পরিশোধে ব্যর্থ নন, অস্ত্র ব্যবসায় বা অন্য কোনো অপরাধে জড়িত নন ইত্যাদি।

এ কমিটির কাজ হবে অতীতের মতো কিছু লোককে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করা। এ কমিটির ছাড়পত্র ছাড়া কেউ আগামী সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। এ কমিটিকে আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক বৈধতা দিতে হবে। যদি আমরা এটা করতে সক্ষম হই, তবে বাংলাদেশের রাজনীতি কিছুটা হলেও কলুষমুক্ত হবে এবং দেশে সন্ত্রাসী তৎপরতার অন্যতম কারণ দূরীভূত হবে। এ কাজটি করতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ন্যূনতম আয়ুষ্কালের মধ্যে তা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সে কারণে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমান সংসদ তা করতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পক্ষপাতহীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অবশ্যই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করতে হবে। সেজন্য জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ ব্যবস্থাসহ জাতীয় পরিচয়পত্র বা ন্যাশনাল আইডেনটিটি কার্ড ইস্যু করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজটিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বর্তমানের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয়।

ইলেকশন কমিশনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে আইন প্রণয়ন এবং সেই সঙ্গে ইলেকশন কমিশন সেক্রেটারিয়েটকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে। ইলেকশন কমিশনের জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।

এ তিনটি কাজ করতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বর্তমান সময়সীমা যথেষ্ট নয়। যদি বর্তমান সংসদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্ধারিত সময়সীমা বর্ধিত করতে পদক্ষেপ না নেয়, তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উচিত হবে সুপ্রিমকোর্টে রেফারেন্সের মাধ্যমে এ সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ নেয়া। অন্যথায় একটি নিরপেক্ষ দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান কোনোভাবেই সম্ভব নয়। চাইলে মাননীয় রাষ্ট্রপতি বিশেষ পরিস্থিতির কারণে অধ্যাদেশের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়সীমা বৃদ্ধি করে সংশোধন আনতে পারেন।

যেকোনো কারণেই হোক, আওয়ামী লীগ বা বিএনপি সরকার কেউই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়নি। অথচ এ দুটি প্রধান দল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে জনগণের কাছে ওয়াদাবদ্ধ। এ কারণে যদি বর্তমান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ না নেয়, তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উচিত হবে এ জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া। এ ব্যাপারে তারা সুশীল সমাজের পূর্ণ সমর্থন পাবেন।

আর একটি কাজ যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার করতে পারেন, তবে তারা দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হবেন। দীর্ঘদিন যাবৎ দেশবাসীর দাবি হচ্ছে, ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা। এ কাজটি রাজনীতিবিদদের দ্বারা হওয়ার নয়। সে কারণে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে। ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হলে শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি হবে এবং আমাদের আগামী প্রজন্ম বাংলাদেশকে একটি উন্নততর সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে।

[নিবন্ধটি 'সেন্টার ফর ন্যাশনাল অ্যান্ড রিজিওনাল স্টাডিজ' বাংলাদেশের সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'ইসলামিক ইনফরমেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার' কক্সবাজার কর্তৃক ২৩-৪-২০০৬ তারিখে আয়োজিত 'সন্ত্রাস প্রতিরোধে জাতীয় ঐক্য ঃ ইমাম ও ওলামায়ে কেরামদের ভূমিকা' শীর্ষক ওয়ার্কশপে প্রদত্ত ভাষণের সারসংক্ষেপ]

Source: http://www.dailynayadiganta.com/fullnews.asp?News_ID=10067&sec=4